চেতনা

মার্চ সংখ্যা, ২০২১

যুক্তিবাদীরা গ্রুপ কর্তৃক প্রকাশিত

সূচি-

প্রবন্ধ ও নিবন্ধ

যুক্তিবাদীরা গ্রুপের পত্রিকা **'চেতনা'** মার্চ সংখ্যা, ২০২১

পত্রিকাটি প্রকাশিত হলো আমাদের ওয়েবসাইটে।

সম্পাদকমন্ডলী- প্রসেনজিৎ, অভিষেক, অনিমেষ, পথিক, সায়ন এবং দেবস্মিতা।
যোগাযোগ:
ই-মেইল - yuktibadira@gmail.com
টেলিগ্রাম- https://t.me/Yktibadira

মূল্য- ত্রিশ টাকা
ওয়েবসাইট-
https://rationalists.wixsite.com/chetona

কবিতা

সম্পাদকীয়

অনিচ্ছা সত্ত্বেও মার্চ সংখ্যাটি বের করতে আমরা কিছুটা দেরী করে ফেললাম, তারজন্য মার্জনা করবেন। অনেকেই বলেছেন সংখ্যাগুলি হার্ড কপি পাওয়া যাবে কি না, এখনও হার্ডকপি করার সম্ভবনা নেই। তবে জেরক্স কপি ঠিকানাসহ মূল্য পাঠিয়ে দিলে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে। মার্চ সংখ্যায় খুব কম লেখাপত্র পেলাম, আপনারা এপ্রিল সংখ্যার জন্য লিখতে শুরু করুন। ধন্যবাদ।

যুক্তিবাদী আন্দোলনে কি কিছু পরিবর্তন আসা উচিত?

-ইন্দ্রানুজ রায়

সাহিত্যরসে আমি সদা বঞ্চিত, তাই শুরুতেই লেখার গুণগত মান খারাপ হওয়ার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিতে চাই পাঠকদের কাছ থেকে।

আমি যুক্তিবাদী আন্দোলনের সংস্পর্শে আসি একাদশ শ্রেণিতে পড়ার সময়, যখন আমাদের পদার্থবিদ্যার শিক্ষক শ্রী পার্থ প্রতীম রায় স্যার আমাকে প্রবীর ঘোষের লেখা "অলৌকিক নয়, লৌকিক" বইটির প্রথম খন্ড পড়তে বলেন। বইটি পড়ে একাধারে আমি বিস্মিত হই আর তারই সাথে বহুদিনের অজানা প্রশ্নের উত্তর পাই। তবে একটি প্রশ্ন আমার মনে ঘুরতে থাকে, যে কেন যুক্তিবাদীদের এত সাফল্যের পরও আজ নতুন উদ্দিপনার সাথে সদগুরুর মত ভন্ড বাবাজিদের প্রতাপ বেড়েছে? কেন আমরা ক য়েক দশক আগের মত মানুষকে পাশে টানতে পারছিনা? আমরা পিছিয়ে পরলাম, নাকি বাবাজিরা এগিয়ে গেল? সেই ভাবনা থেকে আসা আমার কিছু বক্তব্য আমি তুলে ধরতে চাই আপনাদের সামনে, যাতে এই বিষয় তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে আমরা নিজেদের উন্নতি করতে পারি।

প্রথম প্রশ্ন: মানুষ জ্যোতিষি, "স্পিরিচুয়াল গুরু"দের কাছে কেন যায়? কোনো ইন্সিকিউরিটি থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায়। সেখান থেকে ফল হোক বা না হোক, কেন আবার যায়? এটা জানার জন্যে আমি আমার "গ্রহরত্ন"ধারি সহপাঠিদের মধ্যে সার্ভে চালাই। ৫০জনকে প্রশ্ন করে জানতে পারি জ্যোতিষির সাথে কথা বলার পর তারা অনেকটা মানসিক শান্তি ফিরে পেয়েছে। শুধু তাই নয়, তাদের পড়ার প্রতি অমনোযোগের মত সমস্যার অনেকটা সমাধানও হয়েছে বলে তাদের মনে হয়। ব্যাপারটা গোলমেলে লাগে, তাই আমিও জ্যোতিষির সাথে কথা বলব বলে ঠিক করি। অনিমেষ শাস্ত্রির সাথে ফোনে কথা বলা যাবেনা জেনে আমি নাটক করি আমি প্যারালিসিসে আক্রান্ত, তাই ফোনে কথা বলতে চাই। আমার পরিচিত এক দাদা অনলাইন ব্যাংকিংএর মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য করে ও আমার কথা হয়। প্যারালিসিস ছাড়া বাকি সমস্যা আমি সত্যি বলি। লক্ষ্য করলাম, গ্রহরত্নের ভাঁটবকা ছাড়া উনি যেটা করলেন, সেটিকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় কাউন্সিলিং বলে। সমস্যা খুলে বলার পর আত্মীয়তুল্য ব্যবহার করে সমস্যার সমাধান বোঝানো, যা মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করে। তারপর শুরু করি সদগুরুর YouTube ভিডিও শোনা। সেখান থেকে মনে হয়: ১) উনি ইংরেজি ভালো বলতে পারেন বলে ডিগ্রিধারীরা উনার শরণাপন্ন হন। ২) উনি একজন দক্ষ কাউন্সিলার।

এখান থেকে আমি সিদ্ধান্তে পৌছই এনারা নতুন রূপে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে অবৈজ্ঞানিক চিন্তা ছড়াচ্ছে। বিশ্বায়নের যুগে মানুষ ইঁদুর দৌঁড় দৌঁড়চ্ছে। তার ফলে মানসিক স্বাস্থের উপর চাপ বেড়েছে। অথচ মানসিক স্বাস্থ্য অত্যন্ত স্টিরিওটাইপ্‌ড, ক্লিনিকাল কাউন্সিলিং করাচ্ছে শুনলে লোকে পাগল ভাববে, সেই ভয় যেতে পারেনা। কিন্তু ধর্মিয় গুরুর প্রতি আস্থা সকলের আছে। এই সুযোগকে ব্যবহার করে বাজার মাত করছে "স্পিরিচুয়াল গুরু"রা।

দ্বিতীয় প্রশ্ন: আমরা কি করতে পারি? সমালোচনা না হয় করলাম, কিন্তু শুনবে কারা? কেনই বা আমাদের কথা শুনতে আসবে? একটা ইকোচেম্বারের সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছেনা তাহলে যেখানে আমরাই কথা বলব আর আমরাই শুনব? এই চক্রব্যূহ্য থেকে রেহাই কোন পথে?

আমার মত, আমরাও শিক্ষা নিতে শুরু করি ক্লিনিকাল কাউন্সিলিং-এর। এখন ৬ মাস থেকে ১ বছরের কোর্স হয় অনেক এই বিষ য়ে। তারপর বিনামূল্যে কাউন্সিলিং শুরু করা হোক। তবে কাউন্সিলিং নামে নয়, "যুক্তিবাদী বশিকরন" এর মতো নামে, যেখানে "যুক্তিবাদী বশিকরনের মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধান করা হয়"। শুরুতে লোক কম আসবে, এবং আমাদের যেচে যেতে হবে জনতার মধ্যে। তবে ফল মিলতেই লোকেরা আসা শুরু করবে। বেশ ভালোরকমের ভিত্তি পেলে সম্মেলন করে আমাদের রহস্য ফাঁস করা হবে। একই সাথে ভণ্ডামকে সায়েস্তা অপর দিকে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী আন্দোলনে নতুন জোয়ার আনার প্রবল সম্ভাবনা আছে এতে এর মধ্যে বলে আমার মনে হয়।

আপনাদের পর্যালোচনা ও মতামতের জন্যে আমি অপেক্ষা করে থাকব।

একটা ভেলার খোঁজে ১

-অমিত দাস

প্রশ্ন হল ,একটা আদর্শ সমাজের শত্রু কারা বা কে? কিছু নতুন ভাবনা বা দৃষ্টিকোণ সজীবতার শিকড়প্রসারের পথে প্রধান বাধা হলো চমকিত গুঞ্জরিত প্রচলিত চিত্রকল্পের বাগাড়ম্বর । আমাদের শত্রু কে ?বস্তু না বস্তু আশ্রিত অ-শুভচেতনা , না সন্ধ্যাচেতনচালিত জনগণ ? বস্তু ছাড়া গুণ বা অপগুণের আশ্রয় কোথায়? যদি উভয়কে একসঙ্গে আঘাত করি তবে সুচেতনাপ্রাপ্ত হীরকরাজার সঙ্গেই বা মুখোমুখি হলে কেমন আচরণপ্রকৃতি হবে ? তবে কি রাজনীতিপ্রভাবিত জীবনই একমাত্র কার্যকরী সত্য, নাকি এই প্রশ্নের পেছনেও সমকালের প্রতাপ আছে? নতুন শিক্ষা ও পুরনো শিক্ষার সংঘর্ষে যে শক্তিশূন্যতা তৈরি হয় ,সেই দুই দলেরই আশ্রয় নিজস্ব যে অতীত ,তা-তো ব্যবসায়ীক সত্যপ্রভাবিত ।একথা তো সত্য এখন যা কিছু ঘটছে ,তা কিছুকাল পূর্বে ছিল অন্য। কিংবা এই বর্তমান 'আছে' এবং কিছু পূর্বের 'ছিল' বর্তমান নিয়ন্ত্রণ করে নিরাপত্তার আধারে নির্বাচিত সত্যের দিকে যাত্রা করা সম্ভব যে ব্যষ্টির তা তো সমষ্টিবাচক অপেক্ষা ব্যক্তিগত আলোকপ্রাপ্তিকেই স্বীকার করে । তবে সমাজের জনমানুষদের কি কেবল ক্যানভাস-এর মূঢ়দর্শক হওয়াই নিয়তি, যাদের পোশাক নানারকম রং দিয়ে বারেবারে চেঞ্জ করা যায় । আর কোন না কোন নিয়মে কোন ব্যক্তির অর্ধেক মস্তিষ্কের মাধ্যমে হয়তো কোথাও উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রয়োজনতাড়িত হয়ে চালিত হয় অথবা মঙ্গলের জন্য বাকি অর্ধেক মাথার প্রভাবে প্রভাবিত হয় ?যদি তা-ই হয় তবে মার্কসবাদের টোটেম যাকে বলা হয় 'বিপ্লব ', তা রূপান্তরকামী সাময়িক আশাবাদের জননী । কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বা শ্রীঅরবিন্দের 'সুপারম্যান' বা ব্যাখ্যাতীত মহাচেতনা তবে কি সংকেত দিতে চায়, কতটা অবভাস বা সমসাময়িকতা আক্রান্ত সত্য ,নাকি সমসাময়িকতাই এককমহাসত্য --যার কোন ক্ষয় নেই, সংশ্লেষ শুধু বাখতিনের দ্বিবাচনিকতা। শুধুই আকাশের মেঘ হয়ে সংসার করা ?

হিতবাদী ও 'আত্মানং বিদ্ধিঃ ' এই দুই আদর্শকে নিয়ে কিছুটা সুবিধাবাদী সমন্বয় করেই চলার চেষ্টা করে চলা যায়। আসলে রবীন্দ্রনাথের মতো এই প্রশ তবুও মনে আসে-- ইউরোপের হিতবাদী দর্শন ব্যক্তিগত ও সমাজজীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় হলেও একমাত্র আবশ্যক প্রয়োজনীয় নয় , তা উপায় হতে পারে ,কিন্তু উপেয় নয়। আমরা 'চতুরঙ্গ' দেখি কীভাবে নাস্তিক জগমোহনের নাস্তিকতার ছক ভেঙে যায়, হয়ত এখানেই লুকিয়ে ছিল সার্ত্রের 'বিবমিষা'র কারণ । মনের মধ্যে প্রায়ই প্রশ্ন জাগে মানুষের জন্য তো কাজ করবো ,কিন্তু যাদের জন্য করব তারা যদি বাধা দেয় কিংবা একসময় তাদের যদি প্রয়োজন না থাকে বা শেষ হয়ে যায় ,তবে 'আমি' কী করবো..? একদিকে সেই কর্ম অনাসক্ত না হয়ে করার প্রবণতা চলে আসবে অন্যদিকে সংকীর্ণ উদ্দেশ্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ার তীব্র আকর্ষণ চলে আসবে। তাই এটাই ভালো যখন কোথাও আমার বা কোনো ব্যষ্টির কোনো এক সামাজিক কর্মসত্তার অনুপস্থিতি থাকবে, তখন সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করে দাও , আর যখন দরকার হবে না কারোর, তখন অসীমের সাধনায় লীন হয়ে থাকো। যেসব মানুষ এই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই দুইদিকের দর্শনের হদিশ পেয়েছেন তারা সত্যিই ভাগ্যবান। তাই মনে হয়.. এর থেকে যথাযথ লাইন বা দর্শন এখনো পর্যন্ত আদর্শ জীবনদর্শন--''দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়রে দেবতা।''

আচ্ছা এইযে আলোকপ্রাপ্তি, ব্যক্তিগত মনে ইউটোপিয়ান সমাজ জেগে থাকে এটাই কি নবজাগরণ ,যা ঊনবিংশ শতকে ঘটেছিল-- এটাই কি চিরকালীন শিক্ষার উদ্দেশ্য?!

প্রাইভেট টিউশন

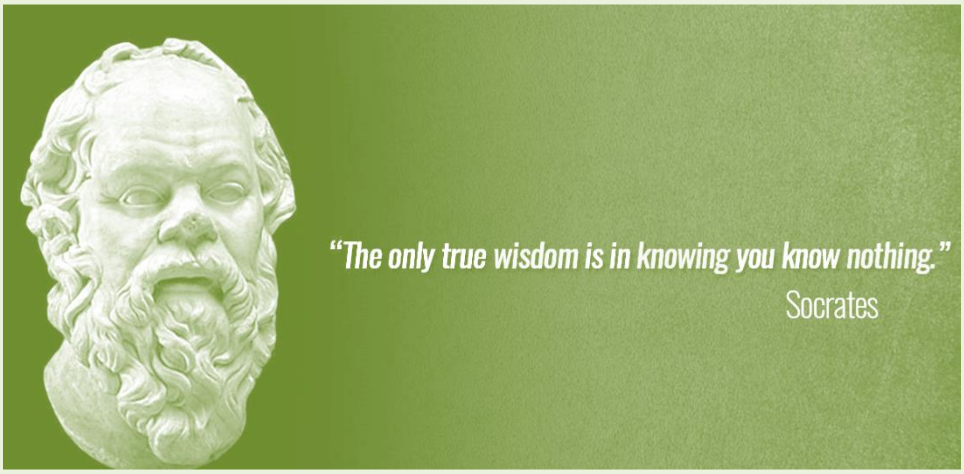
-বিতান সানা

দীর্ঘদিনের হাজারো অভিযোগ, হাজারো নীতি-নির্দেশিকা সত্ত্বেও এক শ্রেণির স্কুলশিক্ষকের প্রাইভেট টিউশন বন্ধ করা যায়নি। করোনা অতিমারিতেও কেউ কেউ অনলাইনে পড়িয়েছেন। লকডাউন উঠলে ফিরে গেছেন সেই পুরোনো অভ্যেসে।
মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আচরণবিধিতেই বলা আছে, স্কুলশিক্ষক-শিক্ষিকারা টিউশন করতে পারবেন না। কিন্তু সেই বিধি আছে বিধিতেই! গত ২-৩ বছরে নানান পত্রপত্রিকায় এই নিয়ে নানান প্রতিবেদন বেরিয়েছে। নানান প্রাইভেট শিক্ষক সংগঠন এই বিধিভঙ্গের বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ করেছেন। সেই স্কুল শিক্ষকদের জিজ্ঞেস করা হলে কেউ বলেছেন তিনি এসব করেন না, বা কেউ বলেছেন আগে করতেন এখন ছেড়ে দিয়েছেন। আসলে এখনও তারা স্বমহিমায় টিউশন করিয়ে চলেছেন। নানান প্রাইভেট শিক্ষক সংগঠনের শিক্ষকরা সেই অভিযুক্ত স্কুল শিক্ষকদের তালিকাও তুলে দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কাছে। উপরিমহল থেকে সেই শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও ফল শূন্য। আসলে কেউই এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে ভেবে দেখতে চাননা। প্রাইভেট শিক্ষক সংগঠন বলতে সেই শিক্ষকদের বোঝাচ্ছি যারা কোনো স্কুল বা কলেজের সাথে যুক্ত নন, কেবল টিউশন করিয়েই যাদের সংসার চলে। এখানে বলে রাখা ভালো যে, বারবার শিক্ষক শব্দটা ব্যবহার করছি কারণ প্রাইভেট টিউশনটা মূলত শিক্ষকরাই করে থাকেন। শিক্ষিকারা নন।
দীর্ঘদিন ধরেই এই ব্যবসা চলছে। বাম আমলেও এর রমরমা ছিলো, তৃণমূলের আমলেও কোনো পরিবর্তন নেই। আমার ধারণা আগামীতে যে সরকারই আসুক না কেন, এর পরিবর্তন হওয়ার নয়। আমি বারাসাত প্যারিচরণ সরকার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। একসময় আমিও এই ব্যবসার অংশ ছিলাম। ব্যবসা বলছি কারণ যেই শিক্ষাটা দেওয়ার জন্য তারা সরকারের কাছ থেকে বেতন পান, সেই শিক্ষাটার কিছু অংশ তারা স্কুলের সকল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে থাকেন আর স্কুলের বাইরে টাকার মাধ্যমে আসল শিক্ষাটা তারা প্রাইভেট টিউশনে ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে থাকেন। আমাদের সময় কেউ কেউ পরীক্ষার প্রশ্নও বিলিয়ে দিতেন। স্কুলের ইউনিট টেস্টের বা ফাইনাল এক্সামের আগে প্রাইভেট টিউশনে যে প্রশ্নের ওপর পরীক্ষা নিতেন, হুবহু অনেক প্রশ্নই স্কুলের পরীক্ষায় চলে আসতো। এটা তখনই ঘটতো যখন সেই শিক্ষকই স্কুলের প্রশ্নপত্র তৈরি করতেন। এই কারণে অনেক ছাত্ররাই নির্দিষ্ট শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট টিউশন পড়তে যেত। ছাত্রদের মা বাবাও চাইতেন তাদের ছেলে ভালো মার্কস পাক। আমার মা বাবার ক্ষেত্রেও এর বদল ঘটেনি, বাবা না চাইলেও মা প্রাইভেট টিউশনের পক্ষপাতী ছিলেন। আমাদের স্কুলের অনেক শিক্ষকরাই স্কুলের শেষে নানান ছাত্রের বাড়িতে প্রাইভেট টিউশন পড়াতেন। কেউ কেউ আবার নিজের বাড়িতেই প্রাইভেট টিউশন সেন্টার খুলে পড়াতেন। ২০১৪ এর দিকে নবম-দশম শ্রেণীর সপ্তাহে একদিন করে টিউশন থাকতো। মাসের রেটটা ছিল এরম: বাংলা ২০০-২৫০ টাকা, ইংরেজী ২৫০-৩০০ টাকা, বিজ্ঞানের প্রতিটা বিষয় ২৫০ টাকা, ইতিহাস ২০০-২৫০ টাকা, ভূগোল ২৫০ টাকা। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের পড়া থাকতো সপ্তাহে দুদিন। রেটটা ছিলো বিজ্ঞান বিভাগের প্রতিটা বিষয় ৬০০-৮০০ টাকা, ইংরেজি- বাংলা ৪০০ টাকা। ইঞ্জিনিয়ারিং জয়েন্টের জন্য মাসের রেট ছিলো ১০০০-১২০০ টাকা। প্রাইভেট টিউশন পড়তে গিয়ে আমরা বন্ধুরা মিলে হিসেব করে দেখতাম একজন শিক্ষক মাসে কুড়ি-ত্রিশ হাজার বা কেউ কেউ চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত ইনকাম করছেন। কারণ তাদের অনেকেই অষ্টম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত প্রাইভেট টিউশন পড়াতেন। প্রতিটা ক্লাসের অন্ততপক্ষে ২-৩টে ব্যাচ থাকতো।
স্কুলের প্রতিটা ক্লাস হতো ৪০ মিনিট করে, একজন শিক্ষক পড়িয়ে যাওয়ার পর আরেকজনের রুমে আসতে ৫-১০ মিনিট সময় লাগতো। ৩০-৩৫ মিনিটে আসলে সেইভাবে পড়া না হলেও, এমন অনেক শিক্ষকই ছিলেন যারা আন্তরিকতার সাথে ওই সময়টুকু পড়াতেন এবং তারা বাইরে প্রাইভেট টিউশনিও করতেন না।
কিছুদিন আগে আমার পাড়াত এক ভাইকে তার স্কুলের পড়া দেখাতে গিয়ে, আমার একটা অভিজ্ঞতা হয়। সেদিন বুঝেতে পারি ওর স্কুলে আসলে পড়াশুনাটাই ঠিকমতো হয়না। বাংলা অক্ষরই সে ঠিকমতো চেনেনা। সহজ বাংলা রিডিং পড়তেই সে হিমশিম খাচ্ছে। বারাসাতেরই একটি বাংলা মিডিয়ামের সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র সে। ওর সাথে কথা বলে জেনেছিলাম ওই ক্লাসে ওর মতো ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা অনেক। কেবল গোনাকয়েক ছাত্রছাত্রীই প্রাইভেট টিউশনের দৌলতে ক্লাসে ভালো

পারফর্ম করছে। আর্থিকভাবে সবল না হওয়ায় ওর সেই সুযোগটা হয়নি। তাই ক্লাস নাইনে এসেও বাংলা রিডিং পড়তেই সে হিমশিম খাচ্ছে।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলোর প্রায় সকল ছাত্রছাত্রীরাই প্রাইভেট টিউশন পড়তে যায়। তারাও জানে স্কুলে ঠিকমতো পড়ানো হয়না, আর সেটার ওপর ভরসা করে থাকলে পরীক্ষায় ভালো মার্কস পাওয়া মুশকিল। ছাত্রছাত্রীদের বাবা-মাও তাই প্রাইভেট টিউশনিতে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করিয়ে দেন, কেবল মার্কসের লোভে পড়ে। শেষমেশ পরীক্ষায় নাম্বারটিই গুরুত্বপূর্ণ কিনা। কলেজের ক্ষেত্রেও তাই। নন-টেকনিক্যাল কলেজে সকল ছেলেমেয়েরাই প্রাইভেট টিউশন পড়ে। টিউশনের আশপাশের জেরক্সের দোকানে গেলেই নোটসএর ফটোকপির বান্ডিল দেখতে পাওয়া যায়। এমন কি যারা প্রাইভেট টিউশন পড়ান, তাদের মধ্যে অনেকেই নানান কলেজে বর্তমানে প্রফেসর পদে রয়েছেন। সরকারের বেতনও নিচ্ছেন, এদিকে বাইরে টাকার বিনিময়ে ছেলেমেয়েদের নোটসও বিলি করছেন।

বর্তমানে প্রাইভেট টিউশন এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে, অনেকের ধারণা প্রাইভেট টিউশন না পড়লে আসল শিক্ষা লাভ হয়না। স্কুল-কলেজের তেমন গুরুত্ব নেই। সরকার বা প্রাইভেট সংস্থার স্কুল/কলেজ তৈরি করার কোনো প্রয়োজন নেই আসলে। স্কুল-কলেজ বর্তমানে শিক্ষার পরিবর্তে কেবল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে রেজাল্টকার্ড আর ডিগ্রি সার্টিফিকেট নেওয়ার স্থান হিসেবে গণ্য হচ্ছে। যদিও প্রান্তিক ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল এখনো গুরুত্বপূর্ণ একটা স্থান কারণ পয়সা খরচ করে শিক্ষা নেওয়াটা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আমার মনে হয় সরকারের নিজ উদ্যোগে প্রাইভেট কিছু টিউশন সেন্টার খুলে দেওয়া উচিৎ। ছেলেমেয়েদের আর কষ্ট করে স্কুল-কলেজে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। তারা সেন্টারে গিয়ে টাকার বিনিময়ে আসল শিক্ষাটা নেবে। যাদের সেই অর্থটা নেই তারা শিক্ষাটা নেবেনা। সরকারও এটাই চায়। টাকা না থাকলে কিসের শিক্ষা? বেশিরভাগ শিক্ষকরা এই 'অর্থ যার, শিক্ষা তার' পরিবেশটাই তৈরি করেছেন। সেই শিক্ষকেরা যারা স্কুলে বা কলেজে শিক্ষকের বা প্রফেসরের দায়িত্বে থেকেও বাইরে প্রাইভেট টিউশন করে এক্সট্রা রোজগার করেন, তাদের বেতন না দিয়ে সরকারের একেবারে ছাত্রছাত্রীদের হাতেই টিউশনের টাকাটা তুলে দেওয়া উচিৎ। তারাই টিউশন পড়ার পর মাস শেষে সেই শিক্ষকদের টিউশনের টাকাটা বেতন হিসেবে তুলে দেবে। স্কুলে ছাত্রহিসেবে আমরা অনেকেই এই ব্যবসার অংশ ছিলাম, কিন্তু, এরমটা চলতে থাকলে আগামীর প্রজন্ম এটাই শিখবে যে স্কুলে/কলেজ পড়াশুনা করার জায়গা নয়, কেবল গিয়ে হাজিরা দেওয়ার জায়গা। সরকার যদি বাজেটে শিক্ষাখাতে আরও বরাদ্দ বাড়িয়ে প্রাথমিক থেকে উচ্চপ্রাথমিক, হাইস্কুলের শিক্ষার পরিকাঠামো আরও ভালো করে ছাত্রছাত্রীদের স্কুলের মধ্যেই উচ্চমানের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতো, তাদের প্রাইভেট টিউশন নেওয়ার কোনো প্রয়োজন পড়তো না। আজকাল আমরা অনেকেই ইউটিউবের নানান চ্যানেলে বিনামূল্যে আধুনিকভাবে শিক্ষাগ্রহণ করে থাকি। ছাত্রছাত্রীদেরকেও যদি সেই কায়দায় স্কুলে পড়ানো যেত, তাদের স্মৃতিতে আরো ভালোভাবে সেই বিষয়গুলো গেঁথে যেত বলে আমার মনে হয়। প্রাইভেট টিউশন পড়ার কোনো প্রয়োজন পড়তোনা। এছাড়া কলেজের ক্ষেত্রেও সিলেবাসে পরিবর্তন আনা বা এরম পরিকাঠামো বানানো দরকার যাতে কোনো ছাত্রছাত্রীকেই প্রাইভেট টিউশন না পড়তে হয়। স্কুল বা কলেজই হয়ে উঠবে প্রথাগত শিক্ষাগ্রহণের একমাত্র স্থান। আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতে এরম একটা দিন আসবেই।



নারী নির্যাতনের সূত্রপাত!

- রাজা দেবরায়

ছোটবেলা থেকেই লিঙ্গভেদের শিক্ষা দেওয়া হয় বাড়িতে এবং সমাজে!

মেয়ে হলেই চুড়ি, নূপুর পরানোর আপ্রাণ প্রচেষ্টা দেখা যায় সমাজে। তাছাড়া লিঙ্গভেদে পোশাক পরানো, মেয়েদের ঘরে আটকে রাখা, ছেলেদের বাইরে যাবার ছুট দেওয়া, ছেলেদের ক্রিকেট, ফুটবল ইত্যাদি আউটডোর গেম খেলতে দেওয়া কিন্তু মেয়েদের ইণ্ডোর গেমের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা কিংবা খুব বেশি হলে বাড়ির উঠোনে খেলতে দেওয়া ইত্যাদি আমাদের সমাজে দেখা যায়। যার ফলস্বরূপ ছোটবেলা থেকেই ছেলে এবং মেয়ে আলাদা, ছেলেরা শক্তিশালী বেশি, ছেলেদের বুদ্ধি বেশি ইত্যাদি কথা সবার মনে গেঁথে যায়। সবথেকে বড় কথা মেয়েদের থেকে ছেলেদের অধিকার বেশি সেই মানসিকতা চলে আসে, যার ফলে অনেক বাড়িতেই ছেলেদের জন্য বড় খাবারের টুকরো, ভালো খাবার, দামী পোশাক ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়।

পুরুষতান্ত্রিকতার নাগপাশে জড়িয়েই নারী নির্যাতনের সূচনা হয়! ছোটবেলা থেকেই ছেলে ও মেয়ে আলাদা বোঝানোর সমাজের যে আপ্রাণ প্রচেষ্টা সেটাই নারী নির্যাতনের সূত্রপাত বলে মনে হয়।।

বেদ বলছে

-সাহেব ইসলাম

বেদ বলছে - একম অদীত্বীয়ম - তিনি এক ও একক,
কুরআন বলছে - কুল হু আল্লাহু আহাদ - বলো আল্লাহ এক

বেদ (অগ্নিমন্ত্র) - না কাসিয়াকা যা নাতা কাদ্বি পাহা - তিনি কাউকে জন্ম দেননি ,আর তাঁকে কেউ জন্ম দেয়নি

কুরআন - লা মিয়ালিদ অলা মিউলাদ - তিনি কাউকে জন্ম দেননি ,আর তাঁকে কেউ জন্ম দেয়নি

বেদ(অগ্নিমন্ত্র) - না সমাদারে তিস্তাথি রূপম আশিয়া ,না চকসোশালা শিয়াতি কাসকানিয়াম - তাকে চোখে দেখা যায় নি ,তার সৃষ্টির ক্যারিশমা অনুভব করা যায় ,তিনি শ্রষ্ঠা সৃষ্ট নয়।

কুরআন (আল মায়েদা) - আল্লাহ বিশ্বচরাচরে যা কিছু আছে সবাই তার সৃষ্টি ,তা দেখে অনুধাবন করো , সবার শ্রষ্ঠা তিনি , তিনি কারোর সৃষ্ট নন।

তাহলে ধর্ম নিয়ে এত মারামারি কেন? উপাসক তো এক।

কবিতা:

সমঝোতা

- বিমুক্তি

দশ টাকার দুটো নোট হাতে নিয়ে বেরিয়েছি,
আজ একটা দফা-রফা করতেই হবে!
আজ দশ টাকার দুটো নোট নিয়ে আমি যাচ্ছি,
রাষ্ট্রের সাথে একটা সমঝোতায় আসতে।

আমি একটা মস্ত বড়ো পাহাড় বেয়ে রাষ্ট্রের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালাম,
আমার হাতে থাকা দশ টাকার নোট দুটি দুমড়ে মুচড়ে গেছে ততক্ষণে,
সেই দুমড়ানো কাগজগুলো ছুঁড়ে মারলাম রাষ্ট্রের মুখে
রাষ্ট্রের নাকের সামনে ঘুষি বাগালাম,
চোখ দুটি বড় করে বললাম,
''জানো তুমি! জানো! গত তিনদিন ক্রমাগত ভাবতে ভাবতে
তোমার দুরবস্থা নিয়ে একটি গল্প লিখেছিলাম।
আমার তিনদিনের পরিশ্রম তোমার কোনো পত্রিকা ছাপাতে চায় নি।
অতঃপর একটি অনলাইন ম্যাগাজিন বিনামূল্যে সেই গল্প ছাপালো।
একটা পয়সাও না নিয়ে, তিনদিনের ভালোবাসা দিলাম,
আর তোমার পুলিশ কি-না আমাকে জেলে পুরার কথা ভাবছে,
তোমারই দুরবস্থা নিয়ে গল্প লেখার কারণে!
তাই নিজের একমাত্র সম্বল দশ টাকার দুটো নোট নিয়ে এসেছিলাম,
তোমার মুখে ছুঁড়বো বলে!"

আমার হাতে মার খেয়ে রাষ্ট্র তখন পুরো নেতিয়ে পড়েছে,
ওর উপরের পাটির অগ্রদন্ত্য দুটি উড়ে গেছে আমার ঘুষিতে।
ফোকলা দাত নিয়ে হাসতে হাসতেই রাষ্ট্র বললো,
"আমি তো নিজে নিজেকে চালাই না।
আমার মানুষেরাও আমাকে চালায় না,
এবং লেখক তুমিও চালাও না।
আমাকে মেরে কি লাভ বলো?"

আমি কথা হারিয়ে রাগে দুঃখে,
দশ টাকার নোট দুটি ওর দাতের ফাঁকে গুজে দিয়ে দৌঁড় দিলাম।
পুলিশ আমাকে খোঁজছে।

৩ মার্চ ২০২১

মুখোশ খোলার শপথ

-শুভায়ূ রুডান

ক্লান্ত চোখে দিনের শেষে ফিরেছি যখন অবশেষে,
দেখেছি আমি চাপা কান্নারা অপেক্ষারত দিনের শেষে।
মুখগুলো সব মুখোশ পরা ভিড়ের মাঝে হাস্যরত,
মুখোশ খুললেই উলঙ্গ রাজা চরিত্রগুলো রাবারের মত।
এসেছে সময় মুখোশ খোলার হাসি গুলো সব মিলিয়ে যাক,
উলঙ্গ রাজা ছুটে পালাক কাপড় খুঁজুক ঢাকতে লাজ।
এবার যখন মিছিলে যাবে সময় নিয়ে দুটো প্রশ্ন কোরো,
তোমাকে যারা স্বপ্ন দেখায়, স্বপ্নগুলো কি যাচাই করো?
এবার যখন মিছিলে যাবে সত্য মিথ্যার হিসেব নিও,
তোমাকে যারা শুধুই ঠকায় এবার তাদের চিনতে শেখো।
যেই মিটিংয়ে ভিড় বাড়াও, মঞ্চে খোঁজো তোমার তুমি,
সেই তুমি কি রেখেছে কথা? নিয়েছে তোমার খোঁজখবর।
সত্তর বছরে তোমার তুমিরা দিয়েছে শুধুই প্রতারণা,
যে দলেই তুমি আস্থা রেখেছ, জুটেছে শুধুই বিরম্বনা।
তাই এবার কোন দলের নয়,দাবী আদায়ের মিছিল হোক,
তাই এবার শেখানো স্লোগান নয়,দাবী গুলোই স্লোগান হোক।
তাই এবার শপথ রক্তে রাঙ্গা,তাই এবার যুদ্ধ হার না মানার,
তাই এবার মগজ দিয়ে মগজ ধোলাই,এবার যুদ্ধ পালটে দেওয়ার।

ফুলের রাজনীতি

-জামাল আনসারী

বঙ্গের ডাঙায় ফুটেছে দুটি ফুল, পদ্ম আর ঘাস।
দুই ফুলের সুগন্ধে আমজনতার উঠছে নাভিশ্বাস।।

কোন ফুল ছোট আবার কোনটা একটু বড়োসড়ো।
ফুলের রাজনীতিতে রাজ্যবাসী ভয়েই জড়োসড়ো।।

ছোট ফুলের নাম শুনলেই বড়ো ফুলের গাত্রজ্বালা হয়।
চোখ বন্ধ করলেও দেখছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে উন্নয়ন।

বড় ফুলটাও নাকি ভাল নয়, গায়ে তীব্র সাম্প্রদায়িক গন্ধ!
বাম-রাম- অতিবাম, ফুলের রাজনীতিতে লাগিয়েছে দ্বন্দ্ব।।

গণতন্ত্র উৎসব নয়, বাংলায় বসেছে গণতন্ত্রের নিলাম
কেউ বিক্রি হচ্ছে কোটি টাকায়, কারো হাজার টাকা দাম।

কোথায় গেল বাঙালির তেজ, আত্মসন্মান, বিবেকবোধ?
বেনিয়াদের কাছে শিরদাঁড়া বেচে গড়ে তুলছে প্রতিরোধ।

ফুলে ফুলে মারামারি, কাটাকাটি চলছে দেশের সমাজসেবা,
রাজনীতিতে দারুন লাভ,ফুলে ফেঁপে উঠছে নেতাদের ব্যবসা।

রাজ্যের কোথাও চলছে গোলাগুলি,কোথাও পড়ছে লাশ।
দুই ফুল মিলেমিশেই রাজ্যবাসীকে দিচ্ছে আচুলা বাঁশ।।

মাদুলি তাবিজ ঝাড়ফুঁক

-জামাল আনসারী

খুড়া ও খুড়া... টিনের আগুড় টা খুল ন চাঁড়ে কইরে,
খুড়া ও খুড়া... টিনের আগুড় টা খুল ন চাঁড়ে কইরে,
তোর ছুটু কাকী বিনা চিকিৎসাই যাবেক রে মইরে।
টিনের ঠকঠকানি আর ডাকা হাঁকার তরে
ধড়ফড়াইয়ে কাঁচা ঘুমেই চইখ কচল্যাই উঠে নিমাই ওঝা,
আগুড়ের ঠিনে আইসে গলার আওয়াজ আন্দাজ কইরে বলে—
এতো রাইতে কে কচ্চি রে আমার নাম ধইরে ডাকাহাকা??
আগুড়ের উল্টো দিকে হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলে,
আমি বঠি রে, নামোও কুহলির তোর মদনা কাকা।
খুল ন, কপাট টা একটু তাড়াতাড়ি,
তোর কাকী কেমন কেমন কইরছে রে,
চাঁড়ে চঅ ন,আমাদের বাড়ী।

মাদুলির ব্যাগটা বগলদাবা কইরে হন্ত দন্ত হইয়ে ছুটে নিমাই ওঝা,
মদনকাকার বাড়িতে ঢুইকেই রোগীকে নাইড়ে চাইড়ে বিজ্ঞের মতো বলে,
মদনা কাকা, একে লতাপাতাই ছুঁইয়াছে,,
মুখের থ্যেইকে ফেনা বাইরাচ্ছে,,
আর পায়ের উপরে দুটি দাগ থ্যেইকে রক্ত বেইরাছে।
আর শুন, বলিস না কাউকেই এই লতাপাতার কথা
আমি যখন আইসেছি তখন হবেই ঠিক ব্যবস্থা।

মদন কাকা ভইয়ে কাঠ,কপাট ধরেই থরথর কাঁপে
মাথায় দুই হাত নিয়ে বলে, কি হবে এবার !
ওঝা তড়িঘড়ি বলে ,ভাগ্যে যা আছে তাই হবে তুমার।
তবে চিন্তা করো না মদন কাকা—
আমি যখন আইসেছি,চেষ্টা কইরছি, ঝাড় ফুঁক কইরে,
"হে মনসা, হে কালী— কাকী যেন না যায় মইরে।
অং বং চং ক্যাং বকের ঠ্যাং এ নমো নমোও,
সাপের বিষ ঝটপট শরীর থ্যেকে নামো নামোও।"
মাদুলি, তাবিজ, জল পড়া, তেলপড়া কত কান্ড!
ঝাড়ফুঁক— শত মন্ত্রেও বিষ আর নামে না,
মুখের ফেনাটা কিছুই কমে না।
রোগীর অবস্থা যখন কাহিল, বাড়িতে কান্নার রোল ওঠে,
মদন কাকা তখন কাকীকে নিয়ে হাসপাতালের পথে ঝড়ের গতিতে ছোটে।
ডাক্তার যখন দেইখল্য রোগীকে,নাড়িটা টিপে টিপে, হাই হাই....
পরীক্ষা কইরে ডাক্তার জানাইলো, রোগী আর বেঁচে নাই।
পুনশ্চ: বিষাক্ত সাপে কাটলে ওঝার`পরে ভরসা করো না।
তুক- তাক, ঝাড়- ফুঁক, করে আর রোগীকে মেরো না।

অভেদ

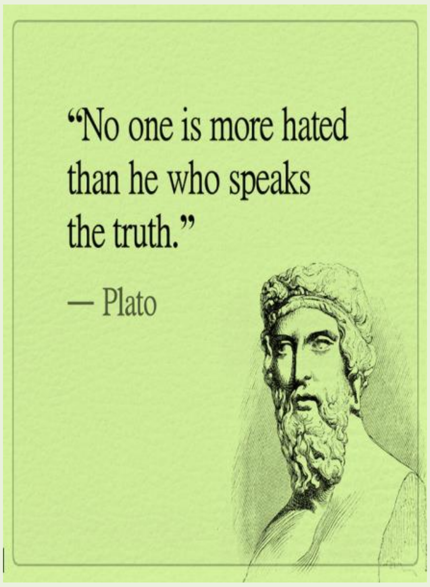
-প্রদীপ চক্রবর্তী।

জলের ধর্ম প্রবাহমানতা
মানুষের মানবতা,
প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম কলে
পিষ্ট আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা।

হিন্দুর রক্ত লাল হলে
মুসলমানেরও তাই,
জগত জুড়িয়া মানব জাতি
কোনো ভেদাভেদ নাই।

কর্ম করলে ফলও মিলবে
বিজ্ঞান শেখায় তাই,
যুক্তিবাদী দার্শনিক মোরা
একে অপরের ভাই।

শোষনমুক্ত সমাজটা চাই
মাথা তুলে বাঁচতে,
শ্রমিকের হাতে হাতুড়ি নাচে
কৃষকের সাথে কাস্তে।



সমাপ্ত